সৌন্দর্যের শোকগাথা: প্রেক্ষিত নারী

দিলরুবা শাহানা

প্রচলিত কথাটি সবারই জানা বোধহয়। যে কথাটি প্রায়ই উচ্চারিত হয় আর তা হল 'সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র'। তবে এখানে বর্নিত সুন্দরী কতিপয় নারী(শুধু সুন্দরী নন এদের মাঝে কারো কারো খ্যাতি জগত আলো করা অতুলনীয় সুন্দরী হিসেবে) তাদের সৌন্দর্য্যের কারণে অসহায়ভাবে বিপদ গ্রস্থ্য হয়েছেন। সৌন্দর্য কখনো বা কাজ হাসিল করার মত শয়তানীর হাতিয়ার হলেও হতে পারে। তবে এদের সৌন্দর্য এদের অসহায়তের মাঝে ঠেলে দিয়েছে।

ইরানীয় বংশোদ্ভুত মির্জা গিয়াসুদ্দিন বেগের কন্যা সুন্দরী মেহেরুন্নিসা তার অতুলনীয় ভুবনমোহিনী রূপের কারণে সম্রাট জাহাঙ্গীরের নজর কাড়েন। এই নারীর রূপে মোহগ্রস্থ আবেগমত্ত মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর সুন্দরীর স্বামী শের আফগান কুলি খানকে ষড়যন্ত্র করে শত্রুদমনে পাঠিয়ে দেন। যুদ্ধে শের আফগান মৃত্যু বরণ করেন। যা ছিল অবধারিত সুপরিকল্পিত এক মৃত্যু। স্বামীর মৃত্যুর চারবছর পর রাজপ্রাসাদে সমাজ্ঞী হিসাব অধিষ্ঠিত হন মেহেরুন্নিসা। তাকে নূরজাহান বা জগতের আলো নামে ভূষিত করেন জাহাঙ্গীর।

শুধু সৌন্দর্য নয় বুদ্ধিমত্তা ও কবিত্বশক্তির অধিকারী এই নারী পঁচাত্তর বয়স পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। আফিম ও মদাসক্ত জাহাঙ্গীরের সাম্রাজ্য পরিচালনায় নূরজাহানের বুদ্ধিদীপ্ত কর্তৃত্ব বিষয়ে অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে তার কবিহৃদয়ের প্রকাশ রয়েছে লাহোরে তার নিতান্ত সাধামাটা কবরে উদ্ধৃত ফার্সীতে লিখিত তারই নিজের কবিতায়। যার কাব্যময় বাংলা অনুবাদের কৃতিত্ব কবি নজরুলের।

'গরীবগোরে দীপ জ্বেলনা
ফুল দিওনা কেউ ভুলে
শামাপোকার না পুড়ে পাখ
দাগা না পায় বুলবুলে'

আরেক সুন্দরী নারী নাতালিয়া গন্চারোভা ছিলেন রুশ কবি আলেক্সান্দর পুশ্কিনের স্ত্রী। ইংরেজী সাহিত্যে যেমন শেক্সপিয়ার রুশ সাহিত্যে পুশকিন তেমনি। নাতালিয়ার সৌন্দর্য অভিসম্পাতের মত পুশ্কিনের দুঃখজনক অকাল মৃত্যু ডেকে আনে। নাতালিয়ার সৌন্দর্যে স্বয়ং রাশিয়ার সম্রাট জারও মুগ্ধ ছিলেন। অভিজাত সম্প্রদায়ের আনন্দঅনুষ্ঠানের হুল্লোড়ে নাতালিয়ার উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্যই জার প্রশাসনে পুশ্কিনকে অনুল্লেখযোগ্য এক দায়িত্ব দিয়ে আটকে রাখা হয়। জারের দরবারে সান্ধ্য বলনাচে নাতালিয়ার উপস্থিতি ছিল এক কথায় অত্যাবশ্যকীয়। কখনো কখনো পুশ্কিনকে অবহেলা করে শুধুই নাতালিয়াকেই আমন্ত্রণ জানানো হতো। পুশ্কিনের জন্য তা বেদনাদায়ক হলেও রূপমুগ্ধ ভক্তদের মোহাবিষ্ট করতে আরও লীলাময়ী হয়ে উঠতেন নাতালিয়া। তেমনি একজন রূপমুগ্ধ ভক্ত ছিলেন জর্জ দান্তেস। নির্বাসিত অভিজাত ফরাসী বংশোদ্ভুত দান্তেস

ছিলেন রাজকর্মচারী। নাতালিয়ার মিষ্টিদুষ্টু ছল্‌চাতুরীতে সখ্‌ মিটলোনা দান্তেসের। নাতালিয়ার আরও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য জর্জ দান্তেস পুশ্‌কিনের গৃহে আগত নাতালিয়ার ছোটবোনকে বিয়ে করেন। এই বিয়ের ঘোর বিরোধী ছিলেন কবি। এমনকি বিয়ের অনুষ্ঠানেও থাকেননি পুশকিন। কবিকে উপহাস করা হয় তার বউসামলানোর অপরাগতা নিয়ে। ক্ষুব্ধ কবি জর্জ দান্তেসের সাথে বন্দুকের ডুয়েল লড়েন। দূভার্গ্য যে অতুলনীয় সুন্দরী নাতালিয়ার প্রতিভাবান কবি লেখক স্বামী পুশকিন মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বয়সে বন্দুকযুদ্ধে মৃত্যু বরন করেন। পুশকিনের অপ্রত্যাশিত করুণ মৃত্যুতে গণবিক্ষোভের আশংকা করেন রুশ সরকার। তাই কবির শেষকৃত্য কঠোর নিরাপত্তার মাঝে সীমিত পরিসরে সম্পন্ন করা হয়। দান্তেসকে রাশিয়া থেকে বহিস্কার করা হয়।
নাতালিয়া গন্‌চারোভা পয়ষট্টি বছর বেঁচেছিলেন। পরে রুশ জার স্বয়ং তার দ্বিতীয় বিয়ের ব্যবস্থা করেন। এ বিয়েতেই নাতালিয়া তার বাকী জীবন গোজরান করেন।

নারীর সৌন্দর্য কি রকম বেকায়দা ফেলে নারীকে, কি রকম বৈষম্যের শিকারে পরিণত করে তাকে তারই একটি বাস্তব ঘটনা বর্নিত হচ্ছে এবার। মারিয়া ডে সেলেস নামে এক সুন্দরী মহিলার স্বামী কর্মক্ষেত্রে দূর্ঘটনায় পড়ে মৃত্যু বরন করেন। নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান মারিয়াকে স্বামীর মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ দেয়ার সময়ে বৈষম্যে প্রদর্শন করে। বৈষম্যটি আইনস্বীকৃত। মারিয়া সুন্দরী সুতরাং তার বিয়ে হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল তাতে মারিয়ার ব্যয়ভার মিটানোর অসুবিধা হবেনা কোন। কর্তৃপক্ষ ১৮৪৮সালের আইনের ধারায় বর্নিত এই যুক্তির ভিত্তিতে মারিয়াকে ১২৫হাজার অষ্ট্রেলীয় ডলার কম ক্ষতিপূরণ প্রদান করেন। মারিয়া ডে সেলেসও ছেড়ে দেওয়ার পাত্রী নন। আদালতে এই ব্রিটিশআমলে প্রণীত আইনের যৌক্তিকতা চ্যালেঞ্জ করেন মারিয়া। শেষ পর্যন্ত আদালত সংশ্লিষ্ট নিয়োগকর্তাকে পুরো ক্ষতিপূরণের অর্থ মারিয়াকে অর্পণ করতে বলেন।

এবারের ঘটনা ইতিহাসের পাতা থেকে নয়, আদালতের নথি থেকে নয়, দৈনন্দিন জীবনে সুন্দরী মেয়েরা কিরকম পরশ্রী কাতর মানুষের অহেতুক নিন্দাকুৎসার লক্ষ্যবস্তু হন সে ঘটনা তুলে ধরা হচ্ছে।
বাংলাদেশের স্নিগ্ধশ্রী একমহিলা বিদেশে এক সেমিনারে এসেছেন। একেতো মহিলা তার উপর বিদেশে সেমিনারে আসা! বিদেশে বসবাসকারী নারীদের উষ্মার উদ্রেক হল। একজন শিক্ষিত ভদ্রলোকের স্ত্রী বলেই বসলেন ‘কে জানে কিভাবে কাকে পটিয়ে পাটিয়ে একেবারে সেমিনারে এসে হাজির’। এমন তাচ্ছিল্য করে মন্তব্য যে সেমিনারে হাজির হওয়াটা একচেটিয়া পুরুষের এক্তিয়ার। অথচ যার সম্বন্ধে মন্তব্য তিনি এক গুণী পরিবারের গুণী সন্তান। তিনপুরুষ ধরে এই পরিবার নানাগুণের জন্য দেশে শ্রদ্ধা ও সম্মান পেয়ে যাচ্ছেন।

সেই নারীর এক শুভানুধ্যয়ী তারকাছে কথাটি সক্ষোভে তুলে ধরেন। তখন সে মেধাবী মহিলা বিষন্ন গলায় বলেন
‘কেন এইকথা বলেছে তা আমার চেহারার দিকে তাকিয়ে আঁচ করতে পারছিসনা?’
‘সত্যিই পারছিনাতো’
‘স্রষ্টা মাথায় শুধু ঘিলুই দেননি চেহারাতেও কবির ভাষায় কিছু শ্রাবস্তীর কারুকাজ করেছেন, যা আমার দূর্ভাগ্য। মেধার চর্চা করে, শ্রম খাটিয়ে যাই কিছু করিনা কেন তার স্বীকৃতি দিতে মানুষের বড় কার্পণ্য। তবে চেহারার কারনে সব আপনাআপনি হয়ে যায় এটা বলে আমার কষ্টে অর্জিত যোগ্যতাকে তুচ্ছ করা হয় সহজেই।’

টেনিস খেলোয়ার আন্না কুর্নিকভার মা আলা কুর্নিকভা এক সাক্ষাতকারে সাংবাদিককে বলেছিলেন ‘আমার মেয়ে ভোরে উঠে পায়ে ফোস্কা ও রক্ত ঝরিয়ে টেনিস রপ্ত করতে এক নাগারে চারঘন্টা যে প্রশিক্ষণ নেয় তারকথা বেশী লিখাও হয়না, বাহ্বাও পায়না। লিখা হয় তার সৌন্দর্য আর আবেদনময় অবয়বের কথা’।
এই কথাগুলো একটি বিষয় তুলে ধরে যে ব্যক্তিত্বময়ী গুণী নারী যিনি নিজ সৌন্দর্যের ব্যাপারে নির্লিপ্ত উদাসীন এমন নারীর সৌন্দর্য দুঃখজনকভাবে তার দক্ষতাকে যথাযোগ্য মর্যাদা পেতে সাহায্যতো করেইনা বরং সীমাবদ্ধতায় আটকে রাখে।